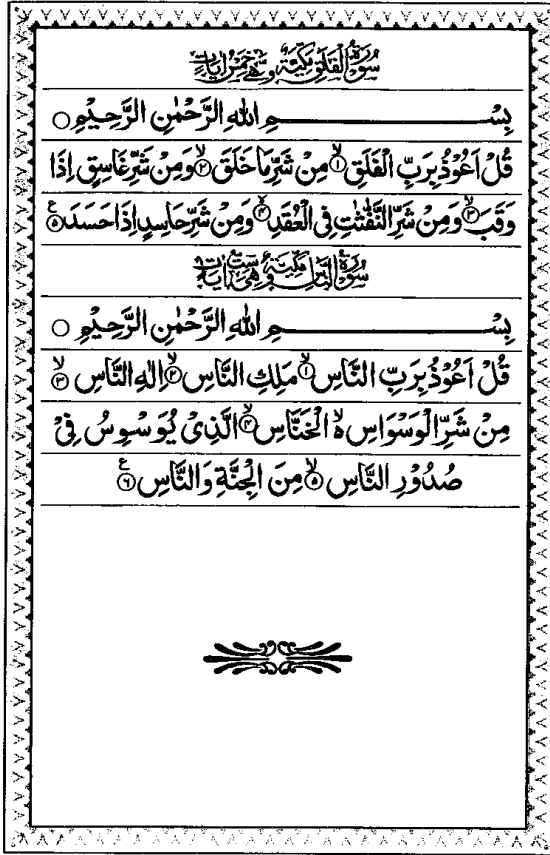


العنق ۳۳ الناس

۴۱۱

ع۳



## সূরা ফালাক

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত ৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

- (১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, (২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, (৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, (৪) গ্রহিতে ফুঁকার দিয়ে জাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে (৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

## সূরা নাস

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত ৬

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

- (১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার (২) মানুষের অধিপতির, (৩) মানুষের মা বৃদের (৪) তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, (৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে (৬) জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

## আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ফালাক ও পরবর্তী সূরা নাস একই সাথে একই ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। হাফেয ইবনে কাইয়্যাম (রহঃ) উভয় সূরার তফসীর একত্রে লিখেছেন। তাতে বলেছেন যে, এ সূরাদ্বয়ের উপকারিতা ও কল্যাণ অপারিসীম এবং মানুষের জন্যে এ দু'টি সূরার প্রয়োজন অত্যধিক। বদনজর এবং সমস্ত দৈহিক ও আত্মিক অনিষ্ট দূর করায় এ সূরাদ্বয়ের কার্যকারিতা অনেক। বলতে গেলে মানুষের জন্যে শ্বাস-প্রশ্বাস, পানাহার ও পোষাক-পরিচ্ছদ যতটুকু প্রয়োজনীয়, এ সূরাদ্বয় তার চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, জনৈক ইহুদী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর জাদু করেছিল। ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। জিবরাঈল আগমন করে সংবাদ দিলেন যে, জনৈক ইহুদী জাদু করেছে এবং যে জিনিসে জাদু করা হয়েছে, তা অমুক কূপের মধ্যে আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) লোক পাঠিয়ে সেই জিনিস কূপ থেকে উদ্ধার করে আনলেন। তাতে কয়েকটি গ্রহি ছিল। তিনি গ্রহিগুলো খুলে দেয়ার সাথে সাথে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে শয্যা ত্যাগ করেন। জিবরাঈল ইহুদীর নাম বলে দিয়েছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে চিনতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার অভ্যাস তাঁর কোন দিনই ছিল না। তাই আত্মবীণ এই ইহুদীকে কিছু বলেননি এবং তার উপস্থিতিতে মুখমণ্ডলে কোনরূপ অভিযোগের চিহ্নও প্রকাশ করেননি। কপটবিশ্বাসী হওয়ার কারণে ইহুদী রীতিমত দরবারে হাযির হত।

সহীহ বোখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর জনৈক ইহুদী জাদু করলে তার প্রভাবে তিনি মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়তেন এবং যে কাজটি করেননি, তাও করেছেন বলে অনুভব করতেন। একদিন তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন : আমার রোগটা কি, আল্লাহ তাআলা তা আমাকে বলে দিয়েছেন। (স্বপ্নে) দুব্যক্তি আমার কাছে আসল এবং একজন শিয়রের কাছে ও অন্যজন পায়ের কাছে বসে গেল। শিয়রের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি অন্য জনকে বলল, তাঁর অসুখটা কি? অন্যজন বলল : ইনি জাদুগ্রস্ত। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল : কে জাদু করল? উত্তর হল, ইহুদীদের মিত্র মুনাফিক লবীদ ইবনে আ'সাম জাদু করেছে। আবার প্রশ্ন হল : কি বস্তুতে জাদু করেছে? উত্তর হল, একটি চিরনীতে। আবার প্রশ্ন হল, চিরনীটি কোথায়? উত্তর হল, খেজুর ফলের আবরণীতে 'বির যরওয়ান' কূপে একটি পাথরের নীচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) সে কূপে গেলেন এবং বললেন : স্বপ্নে আমাকে এই কূপই দেখানো হয়েছে। অতঃপর চিরনীটি সেখান থেকে বের করে আনলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন : আপনি ঘোষণা করলেন না কেন (যে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর জাদু করেছে)? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : আল্লাহ তাআলা আমাকে রোগমুক্ত করেছেন। আমি কারও জন্যে কষ্টের কারণ হতে চাই না। (উদ্দেশ্য, একথা ঘোষণা করলে মুসলমানরা তাকে হত্যা করত অথবা কষ্ট দিত।)

মুসনাদে আহমদের রেওয়াজেতে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই অসুখ ছয় মাস স্থায়ী হয়েছিল। কোন কোন রেওয়াজেতে আরও আছে যে,

কতক সাহায্যে কেলাম জানতে পেরেছিলেন যে, এ দুষ্কর্মের হেতা লাবীদ ইবনে আ'সাম। তাঁরা একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে এসে আরয করলেন : আমরা এই পাপিষ্ঠকে হত্যা করব না কেন? তিনি তাঁদেরকে সে উত্তরই দিলেন, যা হযরত আয়েশা (রাঃ) কে দিয়েছিলেন। ইমাম সা'লাবী (রহঃ) এর রেওয়াজেতে আছে, জনৈক বালক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাজকর্ম করত। ইহুদী তার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর চিরুনী হস্তগত করতে সক্ষম হয়। অতঃপর একটি তাঁতের সূতায় এগারটি গ্রহি লাগিয়ে প্রত্যেক গ্রহিতে একটি করে সুই সংযুক্ত করে। চিরুনীসহ সেই তার খেজুর ফলের আবরণীতে রেখে অতঃপর একটি কূপে প্রস্তরখণ্ডের নীচে রেখে দেয়া হয়। আল্লাহ্ তাআলা এগার আয়াতবিশিষ্ট এ দুটি সূরা নাযিল করলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রত্যেক গ্রহিতে এক আয়াত পাঠ করে তা খুলতে লাগলেন। গ্রহি খোলা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তিনি অনুভব করলেন যেন একটি বোঝা নিজের উপর থেকে সরে গেছে। — (ইবনে-কাসীর)

জাদুগ্রন্থ হওয়া নবুওয়তের পরিপন্থী নয় : যারা জাদুর স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নয়, তারা বিস্মিত হয় যে, আল্লাহর রসূলের উপর জাদু কিরূপে ক্রিয়াশীল হতে পারে। জাদুর স্বরূপ ও তার বিশদ বিবরণ সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে এতটুকু জানা জরুরী যে, জাদুর ক্রিয়াও অগ্নি, পানি ইত্যাদি স্বাভাবিক কারণাদির ক্রিয়ার ন্যায়। অগ্নি দহন করে অথবা উত্তপ্ত করে, পানি ঠাণ্ডা করে এবং কোন কোন কারণের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বর আনে। এগুলো সবই স্বাভাবিক ব্যাপার। পয়গম্বরগণ এগুলোর উর্ধে নন। জাদুর প্রতিক্রিয়াও এমনি ধরনের একটি ব্যাপার। কাজেই তাঁদের জাদুগ্রন্থ হওয়া অবাস্তব নয়।

সূরা ফালাক ও সূরা নাস—এর ফযীলতঃ প্রত্যেক মুমিনের বিশ্বাস এই যে, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত লাভ-লোকসান আল্লাহ তাআলার করায়ত্ত। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কারও অণু পরিমাণ লাভ অথবা লোকসান করতে পারে না। অতএব, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজেকে আল্লাহর আশ্রয়ে দিয়ে দেয়া এবং কাজে কর্মে নিজেকে তাঁর আশ্রয়ে যাওয়ার যোগ্য করতে সচেষ্ট হওয়া। সূরা ফালাকে ইহলৌকিক বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে উভয় সূরার অনেক ফযীলত ও বরকত বর্ণিত আছে। সহীহ মুসলিমে ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : তোমরা লক্ষ্য করেছ কি, অদ্য রাত্রিতে আল্লাহ্ তাআলা আমার প্রতি এমন আয়াত নাযিল করেছেন, যার সমতুল্য আয়াত দেখা যায় না; অর্থাৎ, **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ** ও **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْاَلَمِينَ** আয়াতসমূহ। অন্য এক রেওয়াজেতে আছে, তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর এবং কোরআনেও অনুরূপ অন্য কোন সূরা নেই। এক সফরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) কে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করালেন, অতঃপর মাগরিবের নামাযে এ সূরাদুয়ই তেলাওয়াত করে বললেন : এই সূরাদুয় নিদ্রা যাওয়ার সময় এবং নিদ্রা থেকে গাত্রোথানের সময়ও পাঠ করো। অন্য হাদীসে তিনি প্রত্যেক নামাযের পর সূরাদুয় পাঠ করার আদেশ করেছেন।—(আবু দাউদ, নাসায়ী)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন রোগে আক্রান্ত

হলে এই সূরাদুয় পাঠ করে হাতে ফুঁদিয়ে সর্বাস্তে বুলিয়ে দিতেন। ইস্তেকালের পূর্বে যখন তাঁর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, তখন আমি এই সূরাদুয় পাঠ করে তাঁর হাতে ফুঁক দিতাম। অতঃপর তিনি নিজে তা সর্বাস্তে বুলিয়ে নিতেন। আমার হাত তাঁর পবিত্র হাতের বিকল্প হতে পারত না। তাই আমি এরূপ করতাম। — (ইবনে-কাসীর) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হাবীব (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক রাত্রিতে বৃষ্টি ও ভীষণ অন্ধকার ছিল। আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে ঝুঁজতে বের হলাম। যখন তাঁকে পেলাম, তখন প্রথমেই তিনি বললেন : বল। আমি আরয করলাম, কি বলব? তিনি বললেন : সূরা এখলাস ও কূল আউযু সূরা দুয়। সকাল-সন্ধ্যায় এগুলো তিন বার পাঠ করলে তুমি প্রত্যেক কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।— (মাযহারী)

সারকথা এই যে, যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহায্যে কেলাম এই সূরাদুয়ের আমল করতেন। অতঃপর আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন—

**قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ** —এর শাব্দিক অর্থ বিদীর্ণ হওয়া। এখানে উদ্দেশ্য নিশি শেষে ভোর হওয়া। অন্য এক আয়াতে আল্লাহর গুণ **قَائِمٌ عَلَى الْعَرْشِ** বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আল্লাহর সমস্ত গুণের মধ্য থেকে একে অবলম্বন করার রহস্য এই হতে পারে যে, রাত্রির অন্ধকার প্রায়ই অনিষ্ট ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে এবং ভোরের আলো সেই বিপদাপদের আশংকা দূর করে দেয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইবে, তিনি তার সকল মুসীবত দূর করে দেবেন। — (মাযহারী)

**شُرِّعَ لَكُمْ مِنْ شُرُوعِ الْاَلَمِينَ** — আল্লামা ইবনে কাইয়্যাম (রহঃ) লিখেন : শুর্ব্দটি দু'প্রকার বিষয়বস্তুকে শামিল করে — (এক) প্রত্যক্ষ অনিষ্ট ও বিপদ, যদ্বারা মানুষ সরাসরি কষ্ট পায়, (দুই) যা মুসীবত ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে; যেমন কুফর, ও শিরক। কোরআন ও হাদীসে যেসব বস্তু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা আছে, সেগুলো এই প্রকারদুয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেগুলো হয় নিজেই বিপদ, না হয় কোন বিপদের কারণ।

আয়াতের ভাষায় সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্টই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাজেই আশ্রয় গ্রহণের জন্যে এ বাক্যটিই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এস্থলে আরও তিনটি বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রায়ই বিপদ ও মুসীবতের কারণ হয়ে থাকে। প্রথমে বলা হয়েছে, **عَسَقٌ** — **وَمِنْ شُرُوعِ الْاَلَمِينَ اِذَا وَقَبٌ** শব্দের অর্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান ও মুজাহিদ (রহঃ) **عَسَقٌ** এর অর্থ নিয়েছেন রাত্রি। **وقوب** —এর অর্থ অন্ধকার পূর্ণরূপে বৃদ্ধি পাওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই রাত্রি থেকে যখন তার অন্ধকার গভীর হয়। রাত্রিবেলায় জিন, শয়তান, ইতরপ্রাণী কীট-পতঙ্গ ও চোর-ডাকাত বিচরণ করে এবং শক্ররা আক্রমণ করে। যাদুর ক্রিয়াও রাত্রিতে বেশী হয়। তাই বিশেষভাবে রাত্রি থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় এই : **شُرِّعَ لَكُمْ فِي الْمَقَدِّ**

— **عَفْدٌ** এর অর্থ ফুঁ দেয়া। **عَفْدَةٌ** শব্দটি **عَفْدٌ** এর বহুবচন। অর্থ গ্রহি। যারা জাদু করে, তারা ডোর ইত্যাদিতে গিরা লাগিয়ে তাতে জাদুর মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেয়। এখানে **نَفَاثَاتٌ** স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। এটা **نَفْثٌ** এরও বিশেষণ হতে পারে, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই দাখিল আছে। বাহ্যতঃ

এটা নারীর বিশেষণ। জাদুর কাজ সাধারণতঃ নারীরাই করে এবং জন্মগতভাবে এর সাথে তাদের সম্পর্কই বেশী। এছাড়া রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) —এর উপর জাদুর ঘটনার প্রেক্ষাপটে সূরাদুয় অবতীর্ণ হয়েছে। সেই ঘটনায় ওলীদের কন্যারাই পিতার আদেশে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) — এর উপর জাদু করেছিল। জাদু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কারণ এটাও হতে পারে যে, এর অনিষ্ট সর্বাধিক। কারণ, মানুষ জাদুর কথা জানতে পারে না। অজ্ঞতার কারণে তা দূর করতে সচেষ্ট হয় না। রোগ মনে করে চিকিৎসা করতে থাকে। ফলে কষ্ট বেড়ে যায়।

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে **وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ** — অর্থাৎ, হিংসুক ও হিংসা। হিংসার কারণেই রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) —এর উপর জাদু করা হয়েছিল। ইহুদী ও মুনাফিকরা মুসলমানদের উন্নতি দেখে হিংসার অনলে দগু হত। তারা সম্মুখযুদ্ধে জয়লাভ করতে না পেরে জাদুর মাধ্যমে হিংসার দাবানল নির্বাণিত করার প্রয়াস পায়। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) —এর প্রতি হিংসা পোষণকারীর সংখ্যা জগতে অনেক। এ কারণেও বিশেষভাবে হিংসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

**حَسَدٌ** শব্দের অর্থ কারও নেয়ামত ও সুখ দেখে দগু হওয়া ও তার অবসান কামনা করা। এই হিংসা হারাম ও মহাপাপ। এটাই আকাশে কৃত সর্বপ্রথম গোনাহ এবং এটাই পৃথিবীতে কৃত সর্বপ্রথম গোনাহ। আকাশে ইবলীস আদম (আঃ) —এর প্রতি এবং পৃথিবীতে আদমপুত্র কাবীল তদীয় ভ্রাতা হাবীলের প্রতি হিংসা করেছে — (কুরতুবী) **حَسَدٌ** তথা হিংসার কাছাকাছি হচ্ছে **غِبْطٌ** তথা ঈর্ষা। এর সারমর্ম হচ্ছে কারও নেয়ামত ও সুখ দেখে নিজের জন্যেও তদ্রূপ নেয়ামত ও সুখ কামনা করা। এটা জায়েয; বরং উত্তম।

এখানে তিনটি বিষয় থেকে বিশেষ আশ্রয় প্রার্থনার কথা আছে। কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় বিষয়ের সাথে বাড়তি কথা যুক্ত করা হয়েছে — **عَائِسِيٍّ** এর সাথে **إِذَا وَقَبِيٍّ** এবং **حَاسِدٍ** —এর সাথে **إِذَا حَسَدَ** সংযুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় **نَفَاثَاتٍ** এর সাথে কোন কিছু সংযুক্ত করা হয়নি। কারণ এই যে, জাদুর ক্ষতি ব্যাপক। কিন্তু রাত্রিতে ক্ষতি ব্যাপক নয়; বরং রাত্রি যখন গভীর হয়, তখনই ক্ষতির আশংকা দেখা দেয়। এমনিভাবে হিংসুক ব্যক্তি যে পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে প্রবৃত্ত না হয়, সেই পর্যন্ত হিংসার ক্ষতি তার নিজের মধ্যেই সীমিত থাকে। তবে সে যদি হিংসায় উত্তেজিত হয়ে প্রতিপক্ষের ক্ষতিসাধনে সচেষ্ট হয়, তবেই প্রতিপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রথম ও তৃতীয় বিষয়ের সাথে বাড়তি কথাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে।

### সূরা নাস

০ সূরা ফালাকে জাগতিক বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য সূরা নাসে পারলৌকিক আপদ ও মুসীবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। যেহেতু পরকালীন ক্ষতি গুরুতর, তাই এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে কোরআন পাক সমাপ্ত করা হয়েছে।

**قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ** — এখানে **نَاسٍ** —এর দিকে এবং পূর্ববর্তী সূরায় **فَلْيُ** —এর দিকে **رَبِّ** —এর সম্বন্ধ করা হয়েছে। কারণ এই যে, পূর্ববর্তী সূরায় বাহ্যিক ও দৈহিক বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য এবং

সেটা মানুষের মধ্যে সীমিত নয়। জঙ্ক-জানোয়ারও দৈহিক বিপদাপদ এবং মুসীবতে পতিত হয়। কিন্তু সূরায় শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। এটা মানুষের মধ্যে সীমিত এবং জিন জাতিও প্রসঙ্গতঃ শামিল আছে। তাই এখানে **رَبِّ** শব্দের সম্বন্ধ **نَاسٍ** —এর দিকে করা হয়েছে। — (বায়যাতী)

**مَلِكِ النَّاسِ** — মানুষের অধিপতি **إِلَهِ النَّاسِ** — মানুষের মাবুদ। এ দুটি গুণ সংযুক্ত করার কারণ এই যে, **رَبِّ** শব্দটি কোন বিশেষ বস্তুর দিকে সম্বন্ধ হলে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের জন্যেও ব্যবহৃত হয়; যথা **رَبُّ الدَّارِ** গৃহের মালিক। প্রত্যেক মালিকই অধিপতি হয় না। তাই **إِلَهِ النَّاسِ** বলা হয়েছে। অতঃপর প্রত্যেক অধিপতিই মাবুদ হয় না। তাই **مَلِكِ النَّاسِ** বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ মালিক, অধিপতি, মাবুদ সবই। এই তিনটি গুণ একত্রিত করার রহস্য এই যে, এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি গুণ হেফায়ত ও সংরক্ষণ দাবী করে। কেননা, প্রত্যেক মালিক তার মালিকানাধীন বস্তুর, প্রত্যেক রাজা তার প্রজার এবং প্রত্যেক উপাস্য তার উপাসকদের হেফায়ত করে। এই গুণত্রয় একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার মধ্যে একত্রিত আছে। তিনি ব্যতীত কেউ এই গুণত্রয়ের সমষ্টি নন। তাই আল্লাহ্ তাআলার আশ্রয় সর্বাধিক বড় আশ্রয়। হে আল্লাহ্, আপনিই এসব গুণের আধার এবং আমরা কেবল আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি — এভাবে দোয়া করলে তা কবুল হওয়ার নিকটবর্তী হবে। এখানে প্রথমে **رَبِّ النَّاسِ** বলার পর ব্যাকরণিক নীতি অনুযায়ী সর্বনাম ব্যবহার করে **مَلِكِهِمْ وَرَبِّهِمْ** বলাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু দোয়া ও প্রশংসার স্থল হওয়ার কারণে এই শব্দকে বার বার উল্লেখ করাই উত্তম বিবেচিত হয়েছে। কেউ কেউ **نَاسٍ** শব্দটি বার বার উল্লেখ করার ব্যাপারে একটি রসালো তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেনঃ এ সূরায় **نَاسٍ** শব্দ পাঁচ বার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম **نَاسٍ** বলে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই এর আগে **رَبِّ** অর্থাৎ, পালনকর্তা শব্দ আনা হয়েছে। কেননা, অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারাই প্রতিপালনের অধিক মুখাপেক্ষী। দ্বিতীয় **نَاسٍ** দ্বারা যুবকশ্রেণী বোঝানো হয়েছে। **مَلِكِ** (রাজা, শাসক) শব্দ এর ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, শাসন যুবকদের জন্যে উপযুক্ত। তৃতীয় **نَاسٍ** বলে সংসারভ্যাগী, এবাদতে মশগুল বুড়োশ্রেণীকে বোঝানো হয়েছে। এবাদতের অর্থবাহী ইলাহ শব্দ তাদের জন্যে উপযুক্ত। চতুর্থ **نَاسٍ** বলে আল্লাহ্র সৎকর্মপরায়ণ বান্দা বোঝানো হয়েছে। **وَسُورَةِ** শব্দ এর ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, শয়তান সৎকর্মপরায়ণদের শত্রু। তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করাই তার কাজ। পঞ্চম **نَاسٍ** বলে দুষ্কৃতকারী লোক বোঝানো হয়েছে। কেননা, তাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

**مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ** — যে বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

উদ্দেশ্য অত্র আয়াতে সেই বিষয় বর্ণিত হয়েছে। **وَسْوَاسٍ** শব্দটি ধাতু। এর অর্থ কুমন্ত্রণা। এখানে অতিরঞ্জনের নিয়মে শয়তানকে কুমন্ত্রণা বলে দেয়া হয়েছে; সে যেন আপাদমস্তক কুমন্ত্রণা। আওয়াজহীন গোপন বাক্যের মাধ্যমে শয়তান মানুষকে তার আনুগত্যের আহ্বান করে। মানুষ এই বাক্যের অর্থ অনুভব করে, কিন্তু কোন আওয়াজ শুনে না। শয়তানের এরূপ আহ্বানকে কুমন্ত্রণা বলা হয়। — (কুরতুবী) **خَنَّاسٍ** শব্দটি **خَنَّاسٍ** থেকে উৎপন্ন। অর্থ পশ্চাতে সরে যাওয়া। মানুষ আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করলে পেছনে সরে যাওয়াই শয়তানের অভ্যাস। মানুষ গাফেল হলে

শয়তান আবার অগ্রসর হয়। অতঃপর হুশিয়ার হয়ে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে শয়তান আবার পশ্চাতে সরে যায়। এ কার্যধারাই অবিরাম অব্যাহত থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : প্রত্যেক মানুষের অন্তরে দু'টি গৃহ আছে। একটিতে ফেরেশতা ও অপরটিতে শয়তান বাস করে। (ফেরেশতা সংকাজে এবং শয়তান অসংকাজে মানুষকে উদ্ভুদ্ধ করে।) মানুষ যখন আল্লাহর যিকর করে, তখন শয়তান পেছনে সরে যায় এবং যখন যিকিরে থাকে না, তখন তার চঞ্চু মানুষের অন্তরে স্থাপন করে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। — (মায়হারী)

وَمِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ — অর্থাৎ, কুমন্ত্রণাদাতা জিনের মধ্য থেকেও হয় এবং মানুষের মধ্য থেকেও হয়। অতএব সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ তাআলা রসূলকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন জিন-শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং মানুষ-শয়তানের অনিষ্ট থেকে। এখন জিন-শয়তানের কুমন্ত্রণা বুঝতে অসুবিধা হয় না; কারণ তারা অলক্ষ্যে থেকে মানুষের অন্তরে কোন কথা রাখতে পারে। কিন্তু মানুষ-শয়তান প্রকাশ্যে সামনে এসে কথা বলে। এটা কুমন্ত্রণা কিরূপে হল? জওয়াব এই যে, মানুষ-শয়তানও কারণ সামনে এমন কথা বলে, যা থেকে সেই ব্যক্তির মনে কোন ব্যাপার সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এই সন্দেহ ও সংশয়ের বিষয় সে পরিষ্কার বলে না। শায়খ ইযযুদ্দীন (রহঃ)

তদীয় গ্রন্থে বলেন : মানুষ-শয়তানের অনিষ্ট বলে নফসের (মনের) কুমন্ত্রণা বোঝানো হয়েছে। কেননা, জিন-শয়তান যেমন মানুষের অন্তরে কুসাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে তেমনি স্বয়ং মানুষের নফসও মন্দ কাজেরই আদেশ করে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন নফসের অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসে আছে انى اعوذ بك من اللهم انى اعوذ بك من شر النفسى ومن شر الشيطان وشركه. — হে আল্লাহ আমি আপনার আশ্রয় চাই, আমার নফসের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং শিরক থেকেও।

কোরআনের সূচনা ও সমাপ্তির মিল : আল্লাহ তাআলা সূরা ফাতেহুর মাধ্যমে কোরআন পাক শুরু করেছেন, যার সারমর্ম আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর তাঁর সাহায্য ও সরলপথে চলার তওফীক প্রার্থনা করা। আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও সরলপথের মধ্যেই মানুষের যাবতীয় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কামিয়ারী নিহিত। কিন্তু এ দুটি বিষয় অর্জনে এবং অর্জনের পর তা ব্যবহারে প্রতি পদক্ষেপে অভিশপ্ত শয়তানের চক্রান্ত ও কুমন্ত্রণার জাল বিছানো থাকে। তাই এ জাল ছিন্ন করার কার্যকর পন্থা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা কোরআন পাক সমাপ্ত করা হয়েছে।

সমাপ্ত